NATURE OF 1857

ভারতবর্ষের ইতিহাসে 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রধানত সিপাইদের মধ্যে নানা অসন্তোষের কারণে প্রাথমিকভাবে ইংরেজবিরোধী এই উত্থান শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত দ্রুত নানা শ্রেণীর মানুষ এতে অংশ নিতে শুরু করেছিল। তাই এই বিদ্রোহ যেমন ছিল বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সমাহার, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। *এরিক স্টোক্স* বা *সি. এ. বেইলি*র মতো অনেকেই মনে করেন, এই বিদ্রোহ কোনও একক বিদ্রোহ ছিল না, তা ছিল অনেকগুলি বিদ্রোহের সমাহার। বিদ্রোহের বহুমাত্রিকতাকে বোঝার জন্য প্রথমে এর আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের দিকে দেখা দরকার।

আম্বালা ও মীরাটে সিপাহীদের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটার পরেই বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল দিল্লী দখল করা। 1857 খ্রীষ্টাব্দের 11ই মে বিদ্রোহীদের দ্বারা দিল্লী দখল ভারতের গণবিদ্রোহের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। সমসাময়িক জনৈক ইংরেজ জেলাশাসক *মার্ক থর্ণহিলের* প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দিল্লীর বাদশাহ্-কে যখন পুনরায় সিংহাসনে বসানোর খবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন গ্রামবাসীরা মনে করেছিল, ইংরেজদের রাজত্বের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল বানিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ। সিপাহীদের বিদ্রোহের প্রায় পরে পরেই গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সাধারণ মানুষ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ছিল। *এস. সি.* গুপ্ত বলেছেন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্রোহী মানুষের উদ্দেশ্য ছিল, যে জমিগুলি ব্রিটিশ আদালতগুলির কৌশলে তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করা এবং জমি হস্তান্তরের ফলে যারা লাভবান হয়েছিব তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

14ই মে মুজফ্ফরনগরে সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল এবং এর আগে এই অঞ্চলে সিপাহীদের কোনও বিদ্রোহ হয়নি। *রমেশচন্দ্র মজুমদার* সিপাহী বিদ্রোহকে গণবিদ্রোহ বলে স্বীকার করতে রাজী না হলেও এই ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়েছেন এবং একে একটি ব্যতিক্রম বলে অভিহিত করেছেন। মহাজন ও বেনিয়াদের অর্থলিপ্সা ও উৎপীড়ণের শিকার সাধারণ মানুষ এই অঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছিল। তারা ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ও কালেক্টরেট অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল সাহারানপুর, আলিগড় ও মথুরা অঞ্চলে। সাহারানপুরেও সিপাহীদের বিদ্রোহের আগেই সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করেছিল। মুজাফ্ফরনগরে *খৈরাতি খান* নামে জনৈক বৃদ্ধ পিণ্ডারী এবং ক্ষমতাচ্যুত ভূস্বামী আগষ্ট মাসে জাঠদের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বুলন্দশহর জেলার শিকারপুর অঞ্চলে মালাগড়ের এক পতিত অভিজাত *নবাব ওয়ালিদাদ খান* সৈয়দ ভূস্বামীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বৈবাহিক সূত্রে দিল্লীর বাদশাহ্ বংশের আত্মীয় ছিলেন।

আগ্রার গুপ্তচর বিভাগের প্রধান *উইলিয়াম ম্যুর* 1857 খ্রীষ্টাব্দের 25শে আগষ্ট লিখিত এক চিঠিতে ব্রিগেডিয়ার জনারেল উইলসনকে জানিয়েছিলেন, শুধু বিদ্রোহী সিপাহীরা নয়, জনসাধারণও সাধারণভাবে ব্রিটিশদের বিরোধী হয়ে উঠেছে। 21শে মে বুলন্দশহর জেলার মানকপুর গ্রামের গ্রামপ্রধান *উমরাও সিং* গুজরদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গুজরেরা সরকারী কোষাগার লুন্ঠন করে এবং জেল ভেঙে গুজর বন্দীদের মুক্ত করে দেয়। ঠিক তখনই আলিগড়ের বিদ্রোহী সিপাহীরা বুলন্দশহরে এসে উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ রাজস্ববাবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত গুজরেরা আলিগড় থেকে আসা সিপাহীদের সঙ্গে যৌথভাবে ইংরেজ-বিরোধী অভিযান চালিয়ে যায় এবং দাদরী, ডানকৌর, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি পরগণাগুলিতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। উমরাও সিং নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং নতুন হারে কর বসান। এই অঞ্চলের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট *রবার্টসন* বিদ্রোহ দমন করার জন্য 20শে জুন তাঁর অভিযান শুরু করেন। তৎক্ষণাৎ জেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। *রবার্টসন* তাঁর প্রতিবেদনে আক্ষেপ করে বলছিলেন, শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের মানসিকতায় এত দ্রুত পরিবর্তন কি করে এল, তা বিস্ময়কর। তিনি এও স্বীকার করেন, শুধু লুন্ঠনবৃত্তির জন্য নয়, তারা ইংরেজ শাসনের মদতপুষ্ট *বেনিয়া কা রাজ*-এর উচ্ছেদকল্পে বিদ্রোহী হয়েছে।

31শে মে বেরিলি অঞ্চলের সিপাহী বিদ্রোহ সেখানকার ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায় এবং তারপরই সেখানে গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। *খান বাহাদুর খান* নামে জনৈক রোহিলা নেতা নিজেকে ভারত সম্রাটের সহকারী বলে ঘোষণা করেন এবং রাজস্ব আদায় শুরু করেন। যাবতীয় উচ্চপদে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষকেই নিযুক্ত করেছিলেন। *ম্যালেসন* লিখেছেন, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশগুলির অধিকাংশ মানুষই ব্রিটিশ বিরোধী উত্থানে অংশ নিয়েছিল। শাহ্জাহানপুরের সিপাহী ও সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পুলিশ চৌকি ও সরকারী নথিপত্র ধ্বংস করেছিল। ক্যারু কোম্পানীর মদ কারখানা অগ্নিদগ্ধ হয়। অধ্যাপক

শশীভূষণ চৌধুরী দেখিয়েছেন, উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষ যখন ব্রিটিশরাজের যাবতীয় চিহ্ন মুছে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছিল, তখন জমিচ্যুত তালুকদারেরা সেই সুযোগে, যারা নিলামে জমি কিনে জমির মালিক হয়ে বসেছিল, সেইসব বানিয়াদের কাছ থেকে তাদের হৃত জমি পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। মথুরা, আগ্রা, আলিগড়, বান্দা প্রভৃতি এলাকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মহাজন, বেনিয়া ও থানা। আর শহরাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের বাংলো এবং সরকারী নথিপত্র ছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

একথা প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই মেনে নিয়েছেন যে, অযোধ্যার গণবিদ্রোহ একটি সার্বিক রূপ নিয়েছিল। অযোধ্যার বিদ্রোহে *বেগম হজরত মহাল* তাঁর নাবালক পুত্র *নবাব বির্জিস কাদের*কে সামনে রেখে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে অযোধ্যার বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন সরকার গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোরখপুরের মহম্মদ হাসান, সুলতানপুরের মেহেন্দি হাসান, শঙ্করপুরের বেনীমাধো, বীরহরের উদিতনারায়ণ ও মধুপ্রসাদ, ধুরুয়ার দেবী বক্স সিং প্রমুখ। 1857 খ্রীষ্টাব্দের 13ই সেপ্টেম্বর কোম্পানী সরকার *"Narrative of Events"* নামে একটি দলিল প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছিল, বিদ্রোহ একটি জনপ্রিয় চরিত্র গ্রহণ করার ফলে এবং কারা অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তা চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলে, যে গ্রামগুলির মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, ম্যাজিস্ট্রেটরা সেই গ্রামগুলিকে সামগ্রিকভাবে পুড়িয়ে ফেলতে বা ধ্বংস করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। *হোমস* স্বীকার করেছিলেন, অযোধ্যাতে 1,50,000 সশস্ত্র বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র 35,000 সিপাহী ছিল।

বিহারে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন *কুনওয়ার সিং* নামে এক পতিত ও ক্ষমতাচ্যুত জমিদার। তিনি জগদীশপুর অঞ্চলে প্রায় 20,000 সৈন্যের ছয় মাসের ভরণপোষণের সামগ্রী মজুত রেখেছিলেন এবং নিজ এলাকায় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। বিহারের গয়া জেলায় সাধারণ মানুষ *হায়দার আলি খান* এবং *যুদ্ধর সিং*-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। *যুদ্ধর সিং* নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং সমস্ত গ্রামের জমিগুলি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। গয়ার সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত ওয়াজিরগঞ্জ অঞ্চলে *কুশল সিং* স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। 30শে জুলাই থেকে 5ই আগস্টের মধ্যে রামগড়, লোহারদাগা এবং হাজারীবাগে সিপাহীদের উত্থান হয়েছিল। রাঁচী এবং ডোরাণ্ডা সিপাহীদের হস্তগত হয় এবং সিপাহীরা সরকারী কোষাগার লুন্ঠন করে ও বন্দীদের মুক্ত করে দেয়। সিংভূম ও পালামৌ অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে গণবিদ্রোহ যুক্ত হয়েছিল। এই অঞ্চলের বিদ্রোহ উপজাতি অভ্যুত্থান বা *'tribal insurrection'*-এর রূপ নিয়েছিল। সিংভূমের কোল উপজাতি *অর্জুন সিং*-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। 1859 খ্রীষ্টাব্দে তাদের নেতা ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত কোল উপজাতির মানুষেরা গৌরবময় সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। পালামৌ অঞ্চলের চেরো এবং খরিয়াররা দুই ভাই *পীতাম্বর শাহী* এবং *নীলাম্বর শাহী*র নেতৃত্বে 1859 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। উড়িষ্যার সম্বলপুরে *সুরেন্দ্র সাই*-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গণসংগ্রাম 1862 খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিক পর্যন্ত চলেছিল। সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, *সুরেন্দ্র সাই* সম্বলপুর অঞ্চলে একটি সমান্তরাল সরকার গড়ে তুলেছেন এবং সমগ্র এলাকা এক বিপজ্জনক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রেও রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন, এই পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল।

বিদ্রোহের উত্তাপ পাঞ্জাবকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। সরকার এখানে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে এবং পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ঐতিহ্যগত শত্রুতাকে কাজে লাগিয়েছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবের গভর্ণর *হেনরী লরেন্স* পাঞ্জাবের ভূমিরাজস্বের সাবেকী কাঠামোয় খুব একটা পরিবর্তন আনেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের বিভেদ ও শাসননীতিকে উপেক্ষা করে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা অঞ্চলের শিখরা হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শতদ্রু নদীর দুই তীরে বিদ্রোহীরা বহু সংখ্যক ইংরেজ ও তাদের ভারতীয় সমর্থকদের হত্যা করেছিল। কার্ণাল জেলার জাঠ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতেও গণবিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে সমকালীন ইংরেজ আমলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তীব্র বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। পরের বছরেই *জে. বি. নর্টন* তাঁর *"Topics for Indian Statesman"* নামক রচনায় এই বিদ্রোহকে সাধারণ সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে না দেখে এটাকে একটা গণঅভ্যুত্থান হিসাবেই দেখেছিলেন। কিন্তু *চার্লস্ রেইক্স* তাঁর *"Notes on the Revolt in North Western Province of India"*-তে একে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন। ডাফ, বল, ম্যালেসন প্রমুখ সমকালীন ইংরেজরা অবশ্য এই বিদ্রোহে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার একটি সংগঠিত প্রয়াস দেখতে পেয়েছেন। পরবর্তীকালে বেশ কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সহকারে এই বক্তব্যকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। *রজনীকান্ত গুপ্ত* তাঁর *'সিপাহী যুদ্ধের*

ইতিহাস" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, সিপাহীরা জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছিল। বীর সাভারকারও একে একটি জাতীয় যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। *শশীভূষণ চৌধুরী* তাঁর *"Civil Rebellion in the Indian Mutinies"* গ্রন্থে একে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় যুদ্ধ বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি একে একটি গণবিদ্রোহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এই সংগ্রামের নেতারা *জাতীয়তাবাদের অচেতন যন্ত্র*' বা *'unconcious tool of Nationalism'* হিসাবে কাজ করেছিলেন।

রেইকস উপস্থাপিত মতটিরও সমর্থক প্রচুর। সমসাময়িককালে *কিশোরীচাঁদ মিত্র* লিখেছিলেন, এই অভ্যুত্থান নিছকই সিপাহী বিদ্রোহ। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গডসে ভাটজী নামক জনৈক মারাঠা পর্যটক প্রমুখের বক্তব্যও প্রায় একই। কলকাতার *ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন*' এবং *মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন*' এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছিলেন। *স্যার জন লরেন্স* ও *সিলি* এই বিদ্রোহকে দেশদ্রোহী ও স্বার্থপর সিপাহীদের বিদ্রোহ বলেছেন। *এল. ই. আর. রিস্*-একে ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমানদের খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী আন্দোলন বলেছেন। *টি. আর. হোমস*-এর মতে, এটা ছিল সভ্যতা ও বর্বরতার সংঘাত। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার একে কোনোমতেই জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান বলতে রাজী নন। তাঁর মতে, অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ ছিল নীরব দর্শক। ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার তখন ভ্রূণাবস্থা। তাই জাতীয়তাবাদী চেতনা এই বিদ্রোহকে প্রভাবিত করতে পারে না। অধ্যাপক *সুরেন্দ্রনাথ সেন*ও প্রায় একই বক্তব্য রেখেছেন। বিদ্রোহের পিছনে কোনো জাতীয় নেতৃত্ব বা জাতীয় অভ্যুত্থানের ভূমিকা ছিল না। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক *এরিক স্টোক্স্* এই বিদ্রোহে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এটা ছিল একদল সামন্তপ্রভু ও গ্রামীণ ভূস্বামীর আন্দোলন। *সি. এ. বেইলি* বহু মানুষের অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করলেও জাতীয়তাবাদের ভূমিকাকে মানতে রাজী নন, কারণ প্রান্তিক বা অবক্ষয়প্রাপ্ত এলাকাগুলি থেকেই প্রতিরোধ উঠে এসেছিল।

মহাবিদ্রোহের সমসাময়িককালে *কার্ল মার্কস্* *"New York Daily Tribune"* পত্রিকায় এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বললেও মার্কসবাদী লেখক রজনীপাম দত্তের লেখায় কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর লেখকদের বক্তব্যের সুর স্পষ্ট। তবে পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেখক তলমিজ খালদুন, সুপ্রকাশ রায়, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ একে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রাম হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। খালদুনের মতে, এটা ছিল দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষক-যুদ্ধ। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বহু শ্রেণীর মানুষ যে এতে অংশ নিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং একে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে বর্ণনা করা ঠিক নয়। তাই ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের বক্তব্যকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু অসংগঠিত এই বিদ্রোহে জাতীয়তাবদের প্রেরণা বা ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যটি কতটা কার্যকর ছিল তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। তবে এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা নিয়ে সন্দেহ করে এর অবমূল্যায়ন করা হবে ইতিহাসের অপলাপ।